International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-IX, October 2015, Page No. 01-05
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বিশ শতকের চল্লিশের উত্তাল প্রেক্ষিত : কবি পরমানন্দ সরস্বতী

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract

Paramananda Saraswati (1915-1980) is one of the famous poets of Barak-Valley in the 40th century. Though his poems were not able to draw attention of people at that time, but now a days these are found to be very much contemporary by nature. In young age he has chosen a different path of life and devoted himself to the spiritual apprenticeship, because of this, his poems were not in a position to draw the attention of people. But if we pay a close attention to his life and his creations, we can find him as a great poet. Even at the stage when he was leading a spiritual life, poem was the only thing, he was passionate about. In this research article we are trying to show how he framed a picture of trepidation that occurred in the 40th century.

Key Words: Paramananda Saraswati, Barak-Valley, spiritual apprenticeship

'কোথা হতে এলো জন-সমুদ্রে ঝড়
আকাশ দীর্ণ পুড়ে ছাই প্রান্তর
পিশাচ আলোয় মৃত্যুর বিভীষিকা!
ললাটে অনেক লাঞ্ছনা আছে লেখা
হে কবি-কিশোর দৈব দুর্বিপাক
লও তলোয়ার, লেখনীটি তোলা থাক।'

—পরমানন্দ সরস্বতী

মানুষের চিন্তা-বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলে সমকাল। সমকালের নানা ঘটনা, উপঘটনার টানাপোড়ন প্রতিবিম্বিত হয় তার সৃজন-বিশ্বে। তিনি যদি কবি হন তাহলে তো কথাই নেই। 'কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা' নিয়ে কবিরা সময়ের সহযাত্রী। আবহমানকাল এভাবেই চলে আসছে। দেশে বিদেশে যখনই যে কবিতা রচিত হয়েছে এবং যে কবিতা কালের দরকারে হয়েছে ক্লাসিক, সে কবিতাতেই সমকালীন সময়ের আলোকচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বাংলার আধুনিক কবিদের তুলিতে চিত্রিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক সময়ের প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার জগৎ - আবু সয়ীদ আইয়ূব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে যা "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত অন্তত মুক্তি-প্রয়াসী"[১] এই সব কবিতা বাস্তব ঘেঁষা সমাজজীবন আঁধারী।

দু'দুটি বিশ্ব মহাসমরের ভয়াবহ অভিঘাতের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা ইত্যাদি বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। এই দুর্বিষহ সময়ের ভাষ্য রচনা করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সমর সেন, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অশোক বিজয় রাহা, বিমল চন্দ্র ঘোষ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য ও ঈশান বাংলার কবি ও সন্ন্যাসী পরমানন্দ সরস্বতী। উল্লেখ্য যে পরমানন্দ সরস্বতী পূর্বের নাম মৃণালকান্তি দাশ। (আলোচ্য প্রবন্ধে দুটি নামই ব্যবহৃত হবে।)

মৃণালকান্তি (১৯১৫-১৯৮০) বাল্য ও যৌবনে দু'দুটি বিশ্ব মহাসমরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ) গগনভেদী হাহাকার ও আর্ত-চিৎকারের মধ্যে তাঁর জন্ম (১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি নবযৌবনে ভরপুর কবিতা-পাগল কবি। জন্ম থেকে মানব-দরদি মৃণালকান্তি দাশের সংবেদনশীল কবি হৃদয় চল্লিশের তরঙ্গমুখর সামাজিক বিপর্যয়ে হয়েছে ক্ষতবিক্ষত।

চল্লিশের দশকের শুরুতেই 'আকাশ' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতা বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করলেন কবি মৃণালকান্তি দাশ। এই দশকে তাঁর আরও একখানা কাব্যগ্রন্থ 'দিগন্ত' (১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু এ কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা লেখাও প্রকাশিত হয় চল্লিশের দশকেই।

'আকাশ' ও 'দিগন্তে'র বিভিন্ন কবিতায় তখনকার দুনিয়া জোড়া বিপর্যয়ের ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। 'আকাশের' 'আকাশ' শীর্ষক কবিতায় কবি লেখেন - "বিবর্ণ, পাণ্ডুর দিন রুক্ষ রৌদ্রে পড়ে ঝরে ঝরে। / হে আকাশ, নীল-রাত হেমন্তের নক্ষত্রের জল / নিবিড় ঘুমের মতো ঝরে কোথা পৃথিবীর প'রে / কোথাও উদাও সেই সুন্দর সকাল।"

—'বিবর্ণ, পাণ্ডুর দিন'-এর উল্লেখের মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশকের রক্তক্ষয়ী দিনগুলোর প্রতিভাস ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বাংলার সুন্দর সমাজ জীবন ও যে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল এখানে।
কবি পরমানন্দ সরস্বতী একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন —

> "শৈশব থেকে এক স্বপ্ন দেখছি- এই পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের দীপ জ্বলুক, মুছে নিক বেদনার অন্ধকার- সুন্দর হোক, শান্তির হোক সকলের জীবন, মাটির ঘরে নেমে আসুক স্বর্গ- এ নিয়ে আপন মনে একা একা কত স্বপ্ন বুনেছি, চোখের জলে কত প্রার্থনা জানিয়েছি। কত বিনিদ্র রজনী করেছি যাপন- আকাশের তারা গুণে গুণে বিশাল নীলিমার দিকে চেয়ে চেয়ে- শেষে সেই স্বপ্নের ভূবনকে খুঁজে, মনের মানুষের সন্ধানে ঘর ছেড়ে পথে বার হলাম- চিরদিনের জন্য ছেড়ে এলাম স্বজন বন্ধুদের, আমার ঘরবাড়ী-"[২]

মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের দীপ জ্বালানোর স্বপ্ন ছিল কবি পরমানন্দের জীবন সাধনা। জীবনের চারদিকে যখন 'সফেন সমুদ্র', চলছে অবিশ্রাম ভাঙা গড়া তখন কবি সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পিছুপা হন না। একজন দক্ষ সেনাপতির মতোই 'দিগন্ত'-এর 'বিরোধ' শীর্ষক কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেন— "কোথা হতে এলো জন-সমুদ্রে ঝড়/ আকাশ দীর্ণ পুড়ে ছাই প্রান্তর/ পিশাচ আলোয় মৃত্যুর বিভীষিকা!/ ললাটে অনেক লাঞ্ছনা আছে লিখা।/ হে কবি-কিশোর দৈব দুর্বিপাক লও তলোয়ার, লেখনীটি তোলা থাক।' এখানে পাওয়া যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সংগ্রামী মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত। কবি সমাজকে সুন্দর করে তুলতে উদাও আহবান জানালেন। রোমান্টিক কবিতা বিলাস নয়, সরাসরি সংগ্রামের আহবান। মৃত্যুর শিয়রে বসে নিজের সুপ্ত বিবেককে যেন ডেকে তুলছেন যুবক মৃণালকান্তি। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমারের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বোধে উল্লেখ করা হল—

> "পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই। চারিদিকের আপাত-অসংলগ্ন ছবিগুলির মধ্য দিয়েও সেই রমণীয় বেদনায় পৌঁছানো যায়। এই বেদনা, এই যন্ত্রণাটুকুই তো কবিতার অন্তঃসার। কেউ বুক চাপড়ে কাঁদে, কারুর চোখের কোণে জল; কারুর পাঁজরা গুমরে গুমরে ওঠে, কেউ বা হাসে ম্লান হাসি। যারা বুক চাপড়ায় ইতর-জনেরা তাদের সমাজচেতন বলে। অন্যরা কি সমাজবিমুখ? কেউ না, কেউ না। কবি-মাত্রই সমাজ চেতন।"[৩]

মৃণালকান্তি সর্বার্থে একজন সমাজ সচেতন কবি ছিলেন। তাঁর জীবন সাধনা ও আধ্যাত্ম সাধনার মূল কেন্দ্রে ছিল 'মানুষ'। তাঁর পাঁজর অবশ্যই গুমরে গুমরে কেঁদে উঠেছিল মানবতার বিপর্যয় দেখে। যে সময়ের মধ্য দিয়ে কবির জীবন প্রবহমান ছিল, সে সময়, কোন অবস্থায় অস্বীকার করার উপায় ছিল না সময়ের বিভঙ্গতাকে। গোটা চল্লিশের দশকটাই ছিল মানব সমাজের চরম অবমূল্যায়নের দশক, মানবতার অপমৃত্যুর দশক। অনুভবী কবি মৃণালকান্তিকে মানবতার এই অপমৃত্যু, ছিন্নমস্তা সময়ের বীভৎস প্রতিচ্ছবি ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। চল্লিশের বিধ্বস্ত সময়ের কথা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর 'দিগন্ত' কাব্য গ্রন্থের বহু কবিতায়। কয়েকটি কবিতা উদাহরণস্বরূপ নেওয়া হল —

(ক) চৌদিকে আমার/ ঘোরে রাত্রি ভয় —/ অবরুদ্ধ, রুদ্ধশ্বাস/ সংকীর্ণ সময়।" (পিপাসা)।

(খ) "বিবর্ণ আকাশ/ বিষণ্ণ সময় শুধু ফেলে দীর্ঘশ্বাস।/ নিরালোকে নিরাশ্রয় মন :/ আমাদের স্বপ্ন নেই,/ আমাদের মুক্তি/ বিপন্ন জীবন।" (বিবর্ণ)

(গ) "ক্লিষ্ট জীর্ণ জীবনের কিনারে কিনারে / দীর্ঘসারি প্রেতছায়া ঘোরে / নিরানন্দ পীড়িত সময় / শুধু পাখা নাড়ে।" (দিগন্ত)

'সংকীর্ণ সময়', 'বিষণ্ণ সময়', 'পীড়িত সময়',-এর রূপকল্পে চল্লিশের দশকের বীভৎস বেদনাঘন মুহূর্তের প্রতিরূপ পরমানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি এর ভিতর থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। ... এই সময় চেতনা নিয়েই মানবতার ও কবি মানবের ঐতিহ্য। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে সাহিত্য বা কবিতায় রূপায়িত করতে হলে ভাব প্রতিভার প্রয়োজন — যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানারকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়।[৪] কবি পরমানন্দ সমাজকে বুঝেছিলেন হৃদয় দিয়ে। জীবনানন্দ কথিত 'ইতিহাসচেতনা' ও 'কালজ্ঞান' উভয়েই পরমানন্দের কবিতার মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ (ক) 'আকাশ'-এর 'দিগন্ত' এবং (খ) 'দিগন্ত'-এর 'অভিশপ্ত' শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করা যায় —

(ক) "চেংগিস বুঝি হানা দিলো আজ / মানুষের দরবারে?/ অন্ধ আত্মা ভুখা মরে এই / অস্থির কারাগারে।"

(খ) "কিন্তু এই পৃথিবীর বাতাসেতে মৃত্যুর পিপাসা / নিভে গেছে কত দীপ, লুপ্ত স্মৃতি কত সভ্যতার, / বিছায়ে বিছায়ে রাত্রি বিস্মৃতির নামে অন্ধকার-/ সাজানো সংসার ভাঙে নষ্ট বুদ্ধি কাল সর্বনাশা।" পরমানন্দের ইতিহাসচেতনা বাস্তবিক অর্থে বিস্ময়কর, চল্লিশের দশকের অমানুষিক বর্বরতা বার বার তাঁকে নিয়ে গেছে সুদূর ইতিহাসের কালগর্ভে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সমকালের নিষ্ঠুর বর্বর অমানবিক বীভৎসতার প্রেক্ষাপটের আলোকে সমকালের নিষ্ঠুর বর্বর অমানবিক বীভৎসতার রূপ উদ্ভাসিত করেছেন / দূর ইতিহাসের দিকে যখন চোখ ফেলি তখন ঘাতক চেংগিস খানের নরমেধ যজ্ঞ আমাদের হৃদস্পন্দন থামিয়ে দেয়, চল্লিশের দশকের বিশ্বজোড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের নরমেধ যজ্ঞ কবিকে ভীষণ ভাবিয়েছে, ইতিহাস সচেতন কবি পরমানন্দ চল্লিশের নরমেধ যজ্ঞকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

সমকালীন ইতিহাসের সফল রূপকার ছিলেন কবি মৃণালকান্তি। চল্লিশের দশকের মারণ যজ্ঞের কথা লিখে রেখেছেন কবিতায়— 'মৃত্যু-শকুনি শূন্যে মেলেছে পাখা। / চৌদিকে বাজে ঝঞ্ঝার করতাল-/ পুরানো দিনের ব্যর্থ পরিক্রমা,/ ফুরায়েছে আজ যত ফসলের কাল।" (দিনান্ত : আকাশ) জায়মান সময়ের বিধবস্ত ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। চল্লিশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের বিধ্বস্ত ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। বিশ্ব মহাসমরের দামামায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তখন ভীরু-শঙ্কিত। মৃত্যু দূতেরা মানুষের দরজায় মুহুর্মুহু কড়া নাড়ছে, কিন্তু— "উৎসব শেষ মৃত পাণ্ডুর চাঁদ / আহত নগরী- শূন্য সরাইখানা / অন্ধকারেতে থেকে থেকে শুনা যায় / শুনা যায় কার সকরুণ কান্না।" (দিনান্ত : আকাশ)। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ 'সকরুণ কান্না' পীড়িত মানব জাতির কান্না, 'আহতনগরী'র রূপকে সমকালীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রকেই রূপায়িত করেছেন কবি মৃণালকান্তি। তখনকার সামাজিক বিপর্যয়ের সঠিক ইতিহাস নির্দেশ সন্তোষ কুমার ঘোষের লেখনি থেকে আমরা পাই— "ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসও— সেই সব দুঃস্বপ্নের দিন, নিষ্প্রদীপ, পণ্যমূল্যের উল্লম্ফণ, মন্বন্তর, পাষাণ-পথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষ ভিখারী, দলে দলে নারীর পিছনে নিছক লোভাতুর শরীর শিকারী। বাংলা তখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ব আর টাকার দাম পড়ছে হু-হু করে, পাল্লা দিয়ে, সেই সঙ্গে যথেক মূল্যবোধ, রাস্তার পাশে শব পড়ে থাকতে দেখলে বেওয়ারিশ লাশ বলে পাশ কাটিয়ে যাই— বলতে কি আসল ডিভ্যালুয়েশন, ডিভ্যালুয়েশনের প্রথম পর্যায়। ধীরে ধীরে বিনষ্ট হচ্ছিল ব্যক্তিগত শূচিতা, সম্ভ্রমবোধ, পরিবারগত সম্প্রীতি। অর্থনীতির আনবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল; জীবনকে যদি একটি সংগ্রাম বলি তা-হলে তার নানা রণাঙ্গন জুড়ে ঘটেছিল সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।

তখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পাশ্চাত্য শক্তিকে সমরোদ্যমের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি কলকাতা। এখানে ব্ল্যাক আউট, ওখানে বোমা। এখান থেকে বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই শহরের রাস্তায় পাঁজর সাঁজোয়া গাড়ির ঘর্ষণে অষ্টপ্রহর কেঁপে কেঁপে উঠছে— ফৌজী ছাউনী যত্র তত্র এবং তারই আনুষঙ্গিক জীবন, নিষ্পেষণ এবং প্রলোভন। এত কাছে থেকে সভ্যতার লড়াইয়ের চেহারা প্রদেশ দীর্ঘকাল দ্যাখেনি। ... সমসুখদুঃখভাক্ সমাজের বদলে তৈরী হয়ে যাচ্ছিল উচ্চাবচ অশেষ স্তর, ফাঁপাই টাকার প্রাসাদে ঠিকেদার সাপ্লায়ার ইত্যাদি বিবিধ বৃত্তি। প্রাচুর্যের উদ্গারের পাশাপাশি ক্লিন্ন, কুণ্ঠ জীবনের গ্লানি, বঞ্চনার অভিশাপ আর চিৎকার। আগেও তা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এমন স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি, এমন পাইকারী হারে, মহামারীর আকারে

দেখা যায় নি। এই দেশের অন্যত্রও যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক বিচারে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে লড়াই-এর পাপ আর ছাপ তার উপরেই পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। আর সেই পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা সহ গোটা বাংলা। ওয়ার এফরট? তার দাম অবশ্যই পেয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন, কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি দাম দিয়েছে, ভিতর-বাহিরে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে। ইজ্জত, ইমান আর বুকের রক্ত সেই দামের নাম।”[৫] উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ তবুও প্রয়োজন বোধে পুরো উদ্বৃতই তুলে ধরা হল। সমকালীন এই মূল্যবোধের বিনষ্টি, নির্মম মহাযুদ্ধের নারকীয় হত্যালীলা, সুস্থ চেতনার অবক্ষয়; মানুষের আসুরিক প্রবৃত্তি খুব কাছে থেকে দেখেছেন যুবক কবি মৃণালকান্তি। তাই ব্যথায় ক্ষোভে জ্বলে উঠেছে তাঁর হৃদয়। আর এই জ্বলে ওঠা থেকেই তিনি লেখেন— ‘হেরি রিক্ত হাহাকার হেমন্তের উন্মুক্ত প্রান্তরে/ শ্যামল শষ্যের শীর্ষে ফুরায়েছে ফসলের গান।/ দিগন্তে জ্বলন্ত চিতা—— ব্যর্থদিন করে মৃত্যুস্নান—/ অনাদি কালের— নিরবধি বিষন্নতা ঝরে .../ হেরি শুধু সম্মুখেতে অতীতের হিম অন্ধকার। (রিক্ত/ আকাশ) ‘অতীতের হিম অন্ধকার’ যা ভবিষ্যতকে আরও অন্ধকার করে দিতে পারে, কেননা ‘History repeats itself’।

মৃণালকান্তির কবিতায় কোন রাজনৈতিক স্লোগান নেই। সমকালীন অন্য কবিদের মতো উচ্ছ্বাসময় কবিতা তিনি লেখেননি। কিংবা কবিতা লেখে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেননি তিনি। কিন্তু তাই বলে স্বদেশ, সমাজ ও সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আত্মরতির পরাভবেও ছিলেন না মগ্ন। অর্থাৎ সামাজিক দায়কে অস্বীকার করেননি কোনভাবেই। নিবিড় অন্ধকার সময়কে তিনি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। দ্রষ্টা চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন, জীবনানন্দ কথিত জগৎকে, জীবনকে কবি অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। চল্লিশের দশকের অস্থির সময়ে কবিদের বেড়ে ওঠার একটা স্পষ্ট ছবির আভাস পাই— “দেশকালের এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বড় হয়েছেন চল্লিশের দশকের কবিরা / কলম ধরেছেন সেই টাল মাটাল, রক্তাক্ত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে/ ফলে এ সময়ের কবিরা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তিবোধ নয় ব্যষ্টিবোধে আক্রান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন সমাজমনস্কতার দিকে। এঁদের কাছে তাই কবিতা কখনও দেশ কাল বিরহিত কোনো অ্যাবসার্ড বস্তু হয়ে ওঠেনি, বরং অনেক সময়েই শিল্পের চেয়ে তাঁদের কাছে বেশি জরুরী হয়েছে সামাজিক দায়।”[৬] এই সামাজিক দায়ের কথা কবি মৃণালকান্তি দাশও স্বীকার করেছেন। “কবিতা হবে শুধু সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার উদ্দেশ্যহীন তীব্র, তীক্ষ্ম, অনুভূতির অভিব্যক্তি, — চিত্রল প্রকৃতির বর্ণনা, — গানের মত সরস সুন্দর প্রাণের কথামালা, কতকগুলি ভাব ও রসের কথা- যা নিজেকে অভিনব রূপে ব্যক্ত করবে, প্রকাশ করবে— সমকালীন সমাজজীবনের সমস্যার দেবে নিখুঁত নির্ভুল রূপ— কোনো পথ দেখাবে না তা নয়। কবিতার কাছেও আমরা কিছু পেতে চাই —— শুধু তৃপ্তি নয়, কবিতা দেবে আলো, দেবে অভয় দুঃখ, বেদনা; অন্ধকার কবলিত মানবাত্মাকে জ্যোতির্ময় উত্তরাধিকার!”[৭]

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার মূলস্রোত যে সমাজ চেতনার দিকে বয়ে গেছে, তা সন্দেহাতীত। কবি মৃণালকান্তির কবিতা বিশ্ব তার থেকে কিছু সমীধ শুষে নিয়েছিল। তার সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর কবিতাকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে/ এখানেই তিনি অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্য। চল্লিশের আধুনিক বাংলা কবিতায় এ এক বাড়তি পাওনা। উদাহরণস্বরূপ “মহাভয় দিগদিগন্ত গ্রাসে, রচে কারা বিভীষিকা/ ভৈরব ভ্রমে ভ্রষ্ট দানব ভালে পরায় রক্তটীকা।/... দেবী চান পূজা অমার আহার নিবিড় নিশার বলি,/ দুন্দুর্ভি বাজে দ্বৈত নরকে প্রেত হাসে খলখলি।/ ছাগে ও মানুষে হবে সমভাগ অসহায় আমি তুমি/ দক্ষের দায় তুমি ও কি হায় মেটাবে জন্মভূমি।/ পাপের প্রতিভূ অতি লোভে করে অনর্থ মন্থন।/ বিপরীত রতি বুদ্ধি ঘটায় অরাতির সঙ্গম;/ কালের প্রদীপ মুছে আর ভাঙ্গে এ নিগম নিয়ম।/ সিংহকে দাও অসুর শোণিত শিবাকে গলিত হাড়।/ মহামায়া করে সংহার মুদ্রায় সৃষ্টিকে উদ্বার/ — (‘দিনান্ত’/ দিগন্ত)। চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় ‘দিনান্ত’ কবিতা অনেকটাই ব্যতিক্রম। ঐতিহ্যের বিনির্মাণ করে সমকালকে উদ্ভাসিত করা মৃণালকান্তির কবিতা ছাড়া খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু কোন কোন বরেণ্য সমালোচক ও তাঁর সমগ্র কবিতাবিশ্বকে অনুধ্যান না করেই খন্ড মৃণালকান্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃণালকান্তি দাশকে শুধুমাত্র ‘প্রেমের কবি’ বলে উল্লেখ করেছেন— “‘আকাশ’, ‘দিগন্ত’ এবং ‘উত্তর বসন্তের’ কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মৃণালকান্তি মুখ্যত প্রেমের কবি”।[৮] একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে মৃণালকান্তির কবিতাবিশ্বে সময় ও পরিসর কত ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তখনকার বেশির ভাগ সমালোচকেরই তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বোধ হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সূর্যানন্দের কাছে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে তিনি স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী নাম নিয়ে গৃহত্যাগী হয়ে যাওয়ায় কবি মৃণালকান্তির কবিতায় সামাজিক দিকটি অনেকেই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি। ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে মৃণালকান্তি আক্ষেপের সুরে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে লিখেছেন “আমার নামের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ছাপ যুক্ত বলে অনেক সমালোচকেই কবিতার জাত বিচারে ভুল করেন।”[৯]

একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল দীপালোকে দাঁড়িয়ে আমরা বিংশ শতাব্দীর কবিতার দীর্ঘ ইতিহাসের পাতাগুলোকে যখন উল্টোতে থাকি, তখন মানবতাবাদী কবি মৃণালকান্তির কবিতাগুলো উজ্জ্বল আলোর রশ্মিতে আমাদেরকে ঋদ্ধ করে। কারণ মৃণালকান্তির কবিতায় সময় ও সমকাল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, গুরুত্ব পেয়েছে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনি/ কোন এক অদৃশ্য কারণে সমকালে মৃণালকান্তি বহুল আলোচিত হয়নি। কিন্তু সমকালে বহুল আলোচিত কবিও তো সমকাল পেরিয়ে এসে আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছেন বা যেতে বসেছেন। নির্দিষ্ট কালসীমার গন্ডী পেরিয়ে এসে মৃণালকান্তি আজ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন বিশেষত তাঁর সময়চেতনা ও কবিতার বহুস্বরিক বাচনের জন্য। বাসুদেব দেব মনে করেন "তিনি কোন গজদন্তমিনার বাসী কবি ছিলেন না, ছিলেন না লোকজীবন ও সমাজ, রাষ্ট্রের সীমানা হারানো স্বর্গলোকের পথিক। তিনি ছিলেন আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী, আমাদের প্রাণসখা। এই জীবনের ভালবাসা ও বিরহ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন, আশা ও হতাশার রূপকার ছিলেন তিনি। কেবল ভাগবত লোকের অলৌকিক ও অমোঘ বাণীর কথাই নয়, তিনি শুনিয়েছেন আমাদের এই সমাজের বঞ্চনা ও শোষণের কথাও, শুনিয়েছেন শক্তের প্রমত্ততা, দুর্বলের হাহাকার। দিব্য প্রেমের কবি হয়েও তিনি বৃষ্টি ধারার মতো নেমে এসেছিলেন মানুষের মাটির উঠোনে। সমাজের কল্যাণের জন্য প্রেমিক সন্ন্যাসী সেজেছিলেন সৈনিক। কবিতাকে তিনি ব্যবহার করেছেন চাবুকের মতো, তিনি চিরন্তনের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেননি সাম্প্রতিকের দাবি। চল্লিশের অনেক কবির মতোই তিনি পালন করেছেন তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা। ঝলসে উঠেছেন তিথির বিনাশী ভূমিকা।"[১০] বাসুদেব দেবের সঙ্গে আমরাও সহমত পোষণ করি। গোটা চল্লিশের দশকের প্রামান্য দলিল হয়ে আছে তার কবিতা।

তথ্যসূত্র :

১। আইয়ূব আবু সয়ীদ ও মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্রনাথ, 'আধুনিক বাংলা কবিতা, 'ভূমিকা' ১৯৪০, পৃঃ ১১০।
২। সরস্বতী পরমানন্দ, পত্রসাহিত্য শ্রী পরমানন্দ, (সম্পাদক - শ্রী সুনীলেন্দ্র চৌধুরী) সারস্বত সংস্কৃতি সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ৮৪।
৩। চক্রবর্তী পরিমল, তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্ চিহ্ন, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৭।
৪। দাশ জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৩।
৫। ঘোষ সন্তোষ কুমার, 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, 'এই বাংলা' পৃঃ ১৫৭-৫৮।
৬। সিংহ বিজয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পদাতিক কবি রক্তিম কবিতা', পান্ডুলিপি, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১১৬।
৭। সরস্বতী শ্রী পরমানন্দ, 'পরমানন্দ কাব্যসমগ্র' (যুগ্ম সম্পাদনা) সারস্বত সংস্কৃতি সংস্থা, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৩৭১।
৮। ভট্টাচার্য জগদীশ, 'হে মহাজীবন : স্মরণ অর্ঘ্য' সারস্বত সংস্কৃতি সংস্থা, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ ৯৯।
৯। সরস্বতী শ্রী পরমানন্দ, 'পত্রসাহিত্য শ্রী পরমানন্দ', (সম্পাদক - শ্রী সুনীলেন্দ্র চৌধুরী) সারস্বতী সংস্কৃতি সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৪।
১০। দেব বাসুদেব, 'কবিতা কাল প্রতিমা', মনন প্রকাশন, কলকাতা ২০০৮, পৃঃ ১৩৬-৩৭।